গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ৫ সংখ্যা | ২৬ আগস্ট-১ সেপ্টেম্বর ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

গুজরাটে ধর্ষক-খুনিদের জেলমুক্তি বিপজ্জনক নজির

প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৮ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, ২০০২ সালে গুজরাট গণহত্যার সময়ে গর্ভবতী মহিলা বিলকিস বানোকে ধর্ষণ ও তাঁর শিশুকন্যাকে হত্যা করা সহ গণহত্যা ও গণধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত যে ১১ জন দুষ্কৃতীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, তাদের সাম্প্রতিক মুক্তিদানের ঘটনা চূড়ান্ত নিন্দনীয় ও ভয়ঙ্কর। বিজেপি নেতা ও কর্মীরা নির্লজ্জের মতো যেভাবে ওই দুষ্কৃতীদের মালা পরিয়ে সংবর্ধনা দিয়েছেন এবং মিষ্টিমুখ করিয়ে অভিনন্দিত করেছেন, তা আরও ভয়ঙ্কর।

ঠান্ডা মাথায় নৃশংস অপরাধ করতে পারে যে সব দাগি অপরাধীরা, দলের লোক হলেই বিজেপি কীভাবে সমস্ত আইন ও নীতি-নৈতিকতা অগ্রাহ্য করে তাদের মদত দেয় ও রক্ষা করে, এই ঘটনা তারই আরও একটি নির্লজ্জ উদাহরণ।

সর্বোপরি, এই জঘন্য ঘটনা একটি বিপজ্জনক নজির সৃষ্টি করল। দেশবাসীর কাছে আমাদের আবেদন, বিজেপি সরকারের এই চূড়ান্ত বেআইনি ও অনৈতিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হোন।

ন্যায় বিচারের এই কি পরিণতি
উত্তর দিতে হবে প্রধানমন্ত্রীকেই

বিলকিস বানো

গুজরাটে সদ্য জেলমুক্ত এগারো জন ধর্ষণকারী-খুনিকে ফুলের মালা পরিয়ে সংবর্ধনা দিচ্ছেন শাসকদল বিজেপি-ঘনিষ্ঠ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা। হাসিমুখে চেয়ারে বসিয়ে মিষ্টি খাওয়ানো হচ্ছে দুষ্কৃতীদের। আর এই দৃশ্যটিকে ঘিরে পাক খাচ্ছে এক গণধর্ষিতা নারীর, চোখের সামনে নিজের শিশুকন্যাটিকে খুন হতে দেখা একজন মায়ের আর্ত প্রশ্ন— 'এ ভাবে কি কোনও ন্যায়বিচার শেষ হতে পারে!' এই দৃশ্যকল্প ভারতীয় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের নাগরিক হিসাবে বিশ্বের কাছে লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট করে দেয়। সঞ্চারিত করতে থাকে একটি ভয়ঙ্কর বার্তা— ভোট রাজনীতির পাশাখেলায় উগ্র হিন্দুত্ববাদকে আশ্রয় করতে গিয়ে মানবিকতা, নৈতিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ এবং আইনকেও দু'পায়ে পিষে দিতে শাসক বিজেপির এতটুকু বাধে না। আর তাই দেখে ধর্ষক-দুর্বৃত্তরা ক্রূর হাসি হাসে। তারা আজ আশ্বস্ত— শাসকদলের ছত্রছায়া জোগাড় করতে পারলেই রেহাই মিলবে সমস্ত দুষ্কর্মের শাস্তি থেকে।

১৫ আগস্ট 'স্বাধীনতার 'অমৃত মহোৎসব'-এর দিনে দেশের আইন-কানুন, বিচারব্যবস্থা, সংবিধানে ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষতা, জীবনের অধিকার, নারীর মর্যাদা, মানবিক মূল্যবোধ— সমস্ত কিছুকে গরলের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে

দুয়ের পাতায় দেখুন

গুজরাটের আমেদাবাদে ২০ আগস্ট এআইএমএসএস-এর বিক্ষোভ। বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ

কোচবিহারে ফি-বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনে বর্বর পুলিশি অত্যাচার
গুরুতর আহত ২ জন, জেল হেফাজতে ১৩
ছাত্র ধর্মঘট এআইডিএসও-র

গরিব ছাত্রদের লেখাপড়ার দাবি কি সন্ত্রাসবাদী কাজ? কলেজে ভর্তির ফি কমানোর দাবি কি আজ চরম অপরাধমূলক কাজ বলে চিহ্নিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে? যদি না হয়ে থাকে, তাহলে কোচবিহারে ফি কমানোর দাবিতে আন্দোলন করার দায়ে ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে জেলে পাঠাতে পারল কী করে রাজ্য সরকারের পুলিশ?

১৬ আগস্ট কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি কলেজে এআইডিএসও-র নেতৃত্বে ছাত্ররা ভর্তি-ফি কমানোর দাবি করতে গেলে পুলিশ তাদের উপর নৃশংস আক্রমণ চালায়। ওই কলেজের ছাত্র সুজয় বর্মন এই প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিলেন। এক পুলিশ অফিসার ও সিভিক ভলান্টিয়ার তার গলা টিপে ধরে। প্রায় ৪ ঘণ্টা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলেন তিনি। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই ছাত্র জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

দোষী পুলিশদের শাস্তির দাবিতে পরদিন কোচবিহার এসপিকে স্মারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়। এআইডিএসও-র নেতৃত্বে

এআইডিএসও-র ফি-বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের ওপর পুলিশি হামলা

দুয়ের পাতায় দেখুন

দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিকদের চাপে সঙ্কটে চিকিৎসকরা

শাসকদলের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা-মন্ত্রীরা ইডি, সিবিআইয়ের গ্রেফতারির সামনে পড়ে যেভাবে অসুস্থতার নামে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার তোড়জোড় করে থাকেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ডাক্তারদের ওপর প্রকাশ্যে ও গোপনে যে চাপ সৃষ্টি করা হয়, তা এক ধরনের প্রশাসনিক সন্ত্রাসেরই নামান্তর।

আজ এস এস কে এম থেকে বোলপুর হাসপাতাল— সর্বত্র এ জিনিস চলছে। প্রভাবশালীদের অঙ্গুলি হেলনেই চিকিৎসকদেরকে প্রেসক্রিপশন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। ইডি, সিবিআইয়ের তাড়া খেয়ে মন্ত্রী-নেতারা সরাসরি ভর্তি হয়ে যাচ্ছেন পিজির উডবার্ন ওয়ার্ডে। তখন বাধ্য হয়ে ব্যক্তি চিকিৎসক বা মেডিকেল বোর্ডকে তাদের ভর্তির কারণটা বৈধ বলে প্রতিপন্ন করতে হচ্ছে। কোথায় সেখানে মেডিকেল এথিক্স! বোলপুর হাসপাতালে শাসক দলের নেতারা নির্দেশ দিলেন, হাসপাতাল সুপারকে ওই বিশেষ নেতাদের বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা করার জন্য মেডিকেল টিম পাঠাতে। হাসপাতাল সুপার মেডিকেল এথিক্স, সার্ভিস রুলসের তোয়াক্কা না করে এবং অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবেই, সর্বোপরি মেডিকেল টিমের লিখিত নির্দেশ তৈরি না করে টেলিফোনে চিকিৎসককে নির্দেশ দিলেন ইডি-র নিশানায় থাকা ওই নেতার বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা করতে। নেতা চিকিৎসককে নির্দেশ দিলেন, সাদা কাগজে ১৪ দিনের বিশ্রামের পরামর্শ লিখে দিতে। ঘটনা জানাজানি হতেই নেতা থেকে জেলা সভাধিপতি এবং হাসপাতাল সুপার সকলেই বলছেন, আমরা তো ডাক্তারকে নির্দেশ দিইনি, কেবল অনুরোধ করেছিলাম মাত্র!

বিপন্ন মেডিকেল এথিক্স

চারের পাতায় দেখুন

ছাত্র ধর্মঘট

একের পাতার পর

শান্তিপূর্ণ মিছিল সেদিন এসপি অফিসে পৌঁছলে পুলিশ আবার নিরস্ত্র ছাত্রছাত্রীদের উপর চড়াও হয়। তারা ছাত্রছাত্রীদের জামাকাপড় ধরে টানে, অশ্লীল গালিগালাজ করে, ব্যাপক লাঠি চালায়।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছাত্রকর্মী সুজয় বর্মন

নিস্তার পাননি মহিলা কর্মীরাও। পুরুষ পুলিশ কর্মীরা তাদের ওপরেও হামলা চালায়। কর্মীদের হিংস্র ভাবে টেনেহিঁচড়ে গাড়িতে তোলাই শুধু নয়, দুই ছাত্র সুনির্মল অধিকারী ও দেবাশিস অধিকারীকে ব্যাপক মারধর করে পুলিশ। এসপি অফিসের ভিতরে নিয়ে গিয়ে তাদের এলোপাথাড়ি মারা হয়। দুই ছাত্রই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। পুলিশ অনেক টালবাহানার পর তাদের কোচবিহার এম জে এন মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে চিকিৎসা শুরু করেন। ১৩ জন ছাত্রছাত্রীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, নারীদের উপর নিগ্রহ সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মিথ্যা মামলা সাজানো হয় এবং কোর্ট তাদের ১০ দিনের জেল হেফাজত দেয়। শান্তিপূর্ণ ছাত্র-আন্দোলনকারীদের ওপর হলদিবাড়ি ও কোচবিহারের পুলিশ এবং প্রশাসনের এই বর্বর আক্রমণের প্রতিবাদে ১৮ আগস্ট এআইডিএসও কোচবিহার জেলা জুড়ে ধিক্কার দিবস পালন করে।

সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড মণিশংকর পট্টনায়ক এক বিবৃতিতে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেন, ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি পুলিশ প্রশাসনের এই ভূমিকা শুধুমাত্র এআইডিএসও-র ছাত্রছাত্রীদের ওপরেই নয়, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর, মানুষের যে কোনও ধরনের প্রতিবাদের ওপরেও নির্মম আক্রমণ। একে রুখতে সকল ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সহ সমস্ত পেশার মানুষের কাছে জোট বেঁধে আন্দোলনে সামিল হওয়ার আবেদন জানান তিনি। ১৯ আগস্ট রাজ্যের সমস্ত জেলা ও মহকুমা শহরে ধিক্কার মিছিল হয়। ২৩ আগস্ট কোচবিহার জেলা জুড়ে ছাত্র ধর্মঘট এবং কলকাতা ও শিলিগুড়িতে কেন্দ্রীয় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়।

কলকাতা টিভিতে আয়কর হানা

উদ্দেশ্য ও কারণ প্রকাশের দাবি তুলল এস ইউ সি আই (সি)

'কলকাতা টিভি' চ্যানেলের দপ্তরগুলিতে আয়কর দপ্তরের তল্লাশির পরিপ্রেক্ষিতে এসইউসিআই(সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২২ আগস্ট এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

'কলকাতা টিভি' চ্যানেলের দপ্তরগুলিতে আয়কর দপ্তরের গত ১৬ আগস্টের তল্লাশি বিষয়ে সংবাদমাধ্যমেরও নীরবতা থেকে বোঝা যায়, কেন্দ্রীয় সরকারি নির্দেশেই এই তল্লাশি শুধু নয়, সংবাদ প্রকাশেও সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সংবাদ চ্যানেলটির বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো কী এবং তল্লাশির আশু ফলাফল কী, তা জনগণের জানার অধিকার আছে। এসব কোনও প্রশ্নের কোনও জবাব বা ইঙ্গিত আয়কর দপ্তর এখনও প্রকাশ না করায় এই সন্দেহ স্বাভাবিক যে, এই বিশেষ চ্যানেলটি যেহেতু বিজেপির জনবিরোধী ও দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রচার করে, বিশেষত প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কেও এরা যেহেতু কিছু সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছে, তাই একে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বলি করা হচ্ছে। এর আগেও জাতীয় স্তরের টিভি চ্যানেল 'এন ডি টিভি'-র উপরেও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে হানা হয়। আমরা চাই রাজ্য অথবা কেন্দ্র— যে কোনও সরকার, কোনও সংস্থা বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে তার নিরপেক্ষ তদন্ত হোক, কিন্তু সমাজের সর্বস্তরে যেভাবে বিশেষত বিজেপি-আরএসএস-এর রাজনীতি ও আদর্শের সাথে ভিন্ন মত প্রকাশ করলে তার উপর রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন চলছে, তা কোনও সচেতন নাগরিক মেনে নিতে পারেন না।

এই ঘটনা কেবল সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়, নাগরিক অধিকারেরও পরিপন্থী। আমরা দাবি করছি, অবিলম্বে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে কেন্দ্রের শাসক দলের সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করা বন্ধ হোক এবং ওই সংবাদ চ্যানেলের উপর আয়কর দপ্তরের তল্লাশির সবিশেষ কারণগুলি জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হোক।

উত্তর দিতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে

একের পাতার পর

গুজরাটের বিজেপি সরকার মুক্তি দিয়েছে ১১ জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীকে। এরা কোনও সাধারণ আসামী নয়। ২০০২ সালে কুখ্যাত গুজরাট গণহত্যার সময়ে এরা গণধর্ষণ করেছিল পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা বিলকিস বানোকে। খুন করেছিল তাঁর পরিবারের ১৪ জনকে। পাথরে আছড়ে মাথা থেঁতলে হত্যা করেছিল বানোর তিন বছরের শিশুকন্যাটিকে।

সেদিন ধর্মান্ধ দুষ্কৃতীরা দাহোদ গ্রামে ঘরে ঘরে আগুন লাগালে প্রাণভয়ে দিশাহারা বানো ও তাঁর আত্মীয়রা যখন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছিলেন, তখনই ঘটে এই নৃশংস ঘটনা। ঘটনার বর্বরতায় দেশ জুড়ে শোরগোল ওঠে। পুলিশ বাধ্য হয় পদক্ষেপ নিতে। ২০০৮ সালে ওই ১১ জন দুষ্কৃতীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। এ বছরের শুরুতে এক আসামী কারামুক্তির আবেদন জানালে সুপ্রিম কোর্ট গুজরাট সরকারকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে বলে। গুজরাটের বিজেপি সরকার এমন কমিটি তৈরি করে যার দুই সদস্য বিজেপির বিধায়ক, বাকি দু'জনও দলের সক্রিয় কর্মী। খুব স্বাভাবিক ভাবেই কমিটি দ্রুত ওই ১১ জন অপরাধীর সাজা মকুবের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার দিন রাজ্যের সরকার তাদের মুক্তি দেয়।

জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর যেভাবে হিন্দুত্ববাদীরা ওই ১১ জন গণধর্ষণকারী-খুনিকে সংবর্ধনা দিয়েছে, তাতে দেশ জুড়ে ধিক্কারে সোচ্চার হয়েছে মানুষ। আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার অনুমতি না দিলে রাজ্য সরকারের পক্ষে শাস্তি মকুব করা সম্ভব নয়। ফলে এই দুর্বৃত্তদের কারামুক্তি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অনুমতি ছাড়া সম্ভব নয়। প্রশ্ন উঠেছে, প্রধানমন্ত্রী এই চূড়ান্ত অন্যায় কাজে সম্মতি দিতে পারলেন কী করে? সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে মুখ খুললেই যেখানে সমাজকর্মী থেকে শুরু করে সাংবাদিকদের ইউএপিএ-র মতো কঠোর আইনে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, যখন হাজার আবেদন সত্ত্বেও অসুস্থ, মৃত্যুপথযাত্রী মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মীদেরও মুক্তি, এমনকি জামিন পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না, তখন কোন যুক্তিতে এই ভয়ঙ্কর অপরাধীদের মুক্তি দিল বিজেপি সরকার?

গুজরাট গণহত্যার সময় নরেন্দ্র মোদি ছিলেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সংখ্যালঘু গণহত্যা রোধে তাঁর নিষ্ক্রিয় ভূমিকা দেখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী তাঁকে 'রাজধর্ম' পালনের উপদেশ দিয়েছিলেন। আজ যখন তিনি নিজেই দেশের প্রধানমন্ত্রী, তখন কোন ধর্মের অনুশাসনে এমন অন্যায় আচরণ করলেন নরেন্দ্র মোদি? ২০১৪ সালে গৃহীত সরকারি নীতি অনুযায়ী স্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে, ধর্ষণকারী কিংবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্তদের এ ভাবে মুক্তি দেওয়া যাবে না। তাহলে গুজরাটের বিজেপি সরকার কোন আইনের বলে এ জিনিস করতে পারল? প্রধানমন্ত্রীই বা এই বেআইনি কাজের অনুমতি দিলেন কী করে?

আসলে পুরো সিদ্ধান্তটি ভোট-রাজনীতির স্বার্থে। গুজরাটে বিধানসভা নির্বাচন এ বছরের শেষে। উগ্র হিন্দুত্ববাদকে উস্কে দিয়ে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের সাহায্যে ভোটবাক্স গোছানোর লক্ষ্যেই গণহত্যার অপরাধীদের এভাবে মুক্তি দেওয়া। এই ঘটনার পর আতঙ্ক যেভাবে নতুন করে পিছু নিল বিলকিস ও তাঁর পরিজনদের, গুজরাটে সংখ্যালঘু ভোটারদের আসলে সেই আতঙ্কের আবহেই ঠেলে দিতে চায় বিজেপি। উগ্র সাম্প্রদায়িক পরিবেশ তৈরি করে একদিকে সংখ্যালঘুদের সন্ত্রস্ত করা, অন্যদিকে হিন্দুত্বের চ্যাম্পিয়ন সেজে হিন্দু ভোট একজোট করাই এর লক্ষ্য। রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভোটারদের কাছে এ হল পরিষ্কার বার্তা— বিজেপি-রাজে হিন্দুরা সমস্ত অপরাধের ঊর্ধ্বে, বিশেষ করে সেই অপরাধ যদি ঘটে থাকে সংখ্যালঘু মানুষের সঙ্গে। গুজরাটের এক বিজেপি বিধায়ক তো চরম নির্লজ্জের মতো বলেই দিয়েছেন, 'ধর্ষণকারীরা ব্রাহ্মণ, তাদের সংস্কারও ভাল।' একটি দলের মতাদর্শে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা কী ভয়ঙ্কর ভাবে মিশে থাকলে গণধর্ষণকারী-খুনিদের ভাল সংস্কারের ধারক-বাহক বলা যায়, তা দেখিয়ে দিল এই ঘটনা।

গুজরাটে সাজাপ্রাপ্তদের মুক্তির সিদ্ধান্তের সবচেয়ে বিপজ্জনক দিকটি হল, এই ঘটনায় দুষ্কৃতী-দুর্বৃত্তদের বুঝিয়ে দেওয়া গেল, যত ভয়ঙ্কর অপরাধই তারা করুক না কেন, শাসকদলের আশীর্বাদ মাথায় থাকলে শাস্তির ভয় তো নেই-ই, বাড়তি জুটবে ফুলের মালা। ফলে তাদের আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠার আশঙ্কা তৈরি হল। দেশের নাগরিকদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর অপরিসীম দায়িত্ববোধের প্রমাণ, সন্দেহ নেই! গুজরাটের ওই গণধর্ষণকারী-খুনিদের যেদিন মুক্তি দিল বিজেপি সরকার, সেদিনই লালকেল্লার প্রাচীরে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা দিবসের 'অমৃত মহোৎসবে' ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নারী-মর্যাদা রক্ষার সঙ্কল্প নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই সময়ে পৈশাচিক অত্যাচারের শিকার সন্তানহারা বিলকিসের করুণ মুখটা একবারের জন্যও কি তাঁর মনে পড়েছিল? নাকি সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে বিজেপির বিচারে তিনি 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারতের নাগরিকই নন! বিলকিস ও তাঁর স্বামী তো দেশের বিচারব্যবস্থা, প্রশাসনের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখেছিলেন! ন্যায়বিচার মিলবেই— এই প্রত্যয়ে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের শত হুমকি, দাপট অগ্রাহ্য করে লড়াই করে যাচ্ছিলেন! ধর্ষণকারীদের মুক্তি দিয়ে নারীমর্যাদা রক্ষার কোন উদাহরণ স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী— আজ বিলকিস যদি প্রধানমন্ত্রীকে এই প্রশ্ন করেন, উনি তার উত্তর দিতে পারবেন তো? নাকি ওই ভাষণের পুরোটাই ছিল স্রেফ কথার কারসাজি?

মানুষ প্রশ্ন তুলছে, দেশের বিচারব্যবস্থার ওপর আস্থা রেখে বছরের পর বছর জীবনপণ লড়াই করে বিলকিস বানো কি ভুল করেছেন? আজ তিনি প্রতারিত, অন্তর থেকে নিঃস্ব। ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁর বিশ্বাস টলে গেছে। তিনি বলেছেন, "আমি শুধু আমার কথা বলছি না। প্রতিটি মেয়ে যারা আদালতে ন্যায়ের জন্য লড়ছে, তাদের সকলের জন্য কষ্ট হচ্ছে আমার।"

বাস্তবে বিজেপি সরকারের এই চূড়ান্ত অন্যায়ের জন্য দেশের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই আজ বিলকিস বানোর সমব্যথী। মহিলা সংগঠন এআইএমএসএস-এর পক্ষ থেকে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড ছবি মহান্তি ১৮ আগস্ট এক বিবৃতিতে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। রাজ্যে রাজ্যে এই অন্যায় সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার ও বিলকিস বানোর নিরাপত্তার দাবিতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন সংগঠনের সদস্যরা। এগিয়ে এসেছে আরও অসংখ্য সংগঠন ও সাধারণ মানুষ। তাঁরা বলছেন, পৈশাচিক গণধর্ষণ ও খুনের আসামীদের মুক্তির ঘটনায় শুধু বিলকিস বানো ও তাঁর পরিবার নয়, গোটা সমাজের মানবতা বিপর্যস্ত হল। এ শুধু বিলকিস বানোর নয়, গোটা নারীসমাজের মর্যাদার প্রশ্ন। 'ন্যায়বিচারের এই কি পরিণতি?'— বিলকিসের এই আর্ত প্রশ্নের জবাব তাঁরা নিয়েই ছাড়বেন প্রধানমন্ত্রীর থেকে।

৭৫ বছরে কোন অধিকারটা পেল ভারতবাসী? যদি বলতেন প্রধানমন্ত্রী

গত ২৬ নভেম্বর সংবিধান দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, ভারতের বেশিরভাগ মানুষ অধিকারের কথা বলে, অধিকার দাবি করে সময় নষ্ট করে থাকে। তাঁর আরও আক্ষেপ, অধিকার চাইতে গিয়ে তারা দায়িত্ব ভুলে যাচ্ছে, ফলে দেশ দুর্বল হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী অবশ্য বলতে ভুলে গেছেন, কোন অধিকারটি পেয়ে কোটি কোটি ভারতবাসী সুখে-শান্তিতে জীবন নির্বাহ করছেন? খেয়ে-পরে ঠিকভাবে বেঁচে থাকার অধিকার, বেকারদের কাজ পাওয়ার অধিকার, চাষিদের ফসলের ন্যায্য দামের অধিকার, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরির অধিকার, সকলের জন্য স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার অধিকার, শিশুদের পুষ্টি ও অবাধ বিকাশের অধিকার, অবাধে মত প্রকাশের অধিকার, সরকারকে সমালোচনার অধিকার, প্রতিবাদের অধিকার, শোষিত-বঞ্চিত না হওয়ার অধিকার, বৈষম্যের শিকার না হওয়ার অধিকার, ধর্মবিশ্বাস-জাতপাতের জন্য নির্যাতিত না হওয়ার অধিকার— এর কোনগুলি সাধারণ ভারতবাসী পেয়েছে? আজও সব ভারতবাসী নাগালের মধ্যে পানীয় জলের অধিকারটাও কি পেয়েছে? প্রধানমন্ত্রী বলে দিলে ভাল করতেন, এর মধ্যে কোন অধিকারটি চাইলে সময় নষ্ট করা হয়!

অন্যদিকে, দায়িত্ব পালনের প্রশ্নই যদি ওঠে, তাহলে বলতে হবে, দায়িত্ব পালন করেনি কে? সরকার না জনগণ? দেশের খেটে খাওয়া মানুষ যাঁরা উদয়াস্ত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে উৎপাদন ব্যবস্থাকে চালু রেখেছেন, তাঁরা কোন দায়িত্বটি পালন না করে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছেন? আর দেশের সরকার জনগণকে সুখে রাখার জন্য কোন দায়িত্বটি পালন করেছে?

প্রধানমন্ত্রীর হঠাৎ জনগণকে দায়িত্ব স্মরণ করানোর দরকার পড়ছে কেন? ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, রক্ত ঝরিয়েছেন, তাঁদের সকলের আকাঙ্খা ছিল স্বাধীন ভারতের মানুষ পাবেন সমস্ত দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়ার অধিকার। আশা ছিল ক্ষুধা, বেকারির হাত থেকে ভারতবাসী চিরতরে মুক্তি পাবে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ভগৎ সিংয়ের মতো বিপ্লবী যোদ্ধাদের স্বপ্ন ছিল, স্বাধীন ভারতের মানুষ পাবেন একটা শোষণমুক্ত সমাজ। স্বাধীনতার পর এই আকাঙ্খাকে একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারেননি। এই চেতনা এতটাই জাগ্রত ছিল যে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির যে প্রতিনিধিরা ব্রিটিশের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা দখল করেছিলেন তাঁরাও। জনগণের মৌলিক অধিকারের কথাকে সংবিধানে স্থান দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু আদৌ কোনও অধিকারই জনগণের জোটেনি। যে সংসদীয় গণতন্ত্রের মহিমা কীর্তন শাসকরা করে থাকেন— তার দশা কী দাঁড়িয়েছে? ভোট দিয়ে নিজের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকারটাও কি খেটে খাওয়া মানুষের আছে?

কিন্তু স্বাধীনতার ৩০ বছর পেরনোর আগেই কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী সংবিধান সংশোধন করে তাতে ঢোকালেন জনগণের অধিকারের কথার বদলে জনগণকেই শাসকদের জন্য দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে মুখ বুজে। তিনি ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনীর সাহায্যে সংবিধানে ঢুকিয়েছিলেন ১০টি 'মৌলিক দায়িত্ব'। তাতে সরকারি সম্পত্তি রক্ষা থেকে শুরু করে, পরিবেশ রক্ষা, দেশের মুখ রক্ষা ইত্যাদির সব দায় চাপিয়ে দেওয়া হয় জনগণের ঘাড়ে। জনগণকে দিয়ে এই সব দায়িত্ব পালন করানোর অজুহাতে সরকার যে কোনও গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার রাস্তা করে নেয়। ২০০২ সালে বিজেপি প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর সরকার ইন্দিরাজির উত্তরাধিকার বহন করে সংবিধানে একাদশতম কর্তব্য যোগ করে। যাতে রাষ্ট্রের বদলে পিতা-মাতার উপরই চাপানো হয়েছিল সন্তানদের শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব। এর ফল হল শিক্ষার দায়িত্ব আর সরকারের নয়।

শাসকরা কোন দায়িত্ব পালন করলেন?

স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের বুর্জোয়া শাসকরা নিজেরা কোন দায়িত্ব পালন করেছে? তাদের 'দায়িত্ব' পালনে জনগণ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছে, আর মুষ্টিমেয় ধনকুবেরদের সিন্দুকে ক্রমাগত জমা হয়েছে জনগণের ঘর থেকে লুণ্ঠিত বিপুল সম্পদ। নরেন্দ্র মোদি বেশি 'দায়িত্বশীল', অতএব, তাঁর জমানায় এই লুঠের প্রক্রিয়া বেশি গতি নিয়েছে। সম্প্রতি করোনা মহামারীর মধ্যেই ৪১ জন নতুন ভারতীয় ধনকুবেরের সৃষ্টি হয়ে সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ১৪৩। প্রথম ১০০ জন ধনকুবেরের মোট সম্পদ দ্বিগুণের বেশি বেড়ে হয়েছে ৫৭.৩ লক্ষ কোটি টাকা। মাত্র ৯৮ জন ধনকুবেরের হাতে যত সম্পদ আছে (৬৫ হাজার ৯০০ কোটি ডলার, এক ডলারের মূল্য প্রায় ৭৫ ভারতীয় টাকা) তা ৫৫ কোটি ৫০ লক্ষ ভারতবাসীর মোট সম্পদের সমান। প্রথম ১০ জন ধনকুবের যদি প্রতিদিন ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা হিসাবে খরচ করতে থাকে তা হলে তাদের সম্পদ ফুরোতে সময় লাগবে ৮৪ বছর।

অন্য দিকে দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের প্রতি কেমন দায়িত্ব পালন করেছে সরকার? করোনা পরিস্থিতির মধ্যে ৪ কোটি ৬০ লক্ষ ভারতবাসী নতুন করে নেমে গেছে চরম দারিদ্রের অতলে (বিশ্বে নতুন দরিদ্র মানুষের অর্ধেক)। সরকারি হিসাবেই ২৩ কোটি ভারতীয় দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে। করোনার আগেই বিশ্বের দারিদ্র বৃদ্ধিতে ৬০ শতাংশ অবদান রেখেছে নরেন্দ্র মোদি শাসিত ভারত। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ১৩১টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১০১। প্রায় দেড় কোটি নারী শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। মহিলারা আয় হারিয়েছেন ৫৯ লক্ষ কোটি টাকার বেশি। ২০২১ সালে ৮৪ শতাংশ ভারতীয় পরিবারের আয় মারাত্মকভাবে কমে গেছে। করোনার আগেই দেশের বেকারত্বের হার ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বাধিক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল। গত জানুয়ারি (২০২২) তে সেন্টার ফর মনিটারিং ইন্ডিয়া (সিএমআইই) সমীক্ষা জানাচ্ছে, কর্মক্ষম মানুষের মাত্র ৩৭.৬ শতাংশ কাজ পায়। নির্দিষ্ট বেতনের চাকরি থেকে ২.৫ কোটি কর্মী এক বছরে ছাঁটাই হয়েছেন। অসংগঠিত ঠিকা শ্রমিকদের দশা আরও শোচনীয়। ৬ কোটির বেশি কর্মহীন মানুষ কাজ খোঁজার চেষ্টাই ছেড়ে দিয়েছেন। মালিকদের ছাঁটাইয়ের অধিকার বেড়েছে, জনগণের বেড়েছে ক্ষুধার্ত থাকার অধিকার। পাঁচ বছরের নীচে শিশুদের ৩৬ শতাংশই চরম অপুষ্টির শিকার। সরকারি হিসাবেই কমপক্ষে ২০ কোটি ভারতীয় একবেলার বেশি খাবার জোগাড়ে অক্ষম। সরকার এদের জন্য কোনও দায়িত্ব অনুভব করেছে কি? অবশ্যই না। একইভাবে, করোনা মহামারিতে কত লোকের জীবন বিনা চিকিৎসায় শেষ হয়ে গেছে, কত পরিযায়ী শ্রমিক আচমকা লকডাউনে প্রাণ হারালেন, কত জনের কাজ করোনার অজুহাতে চলে গেল, কত লাশ গঙ্গায় ভাসল, এগুলির হিসাব রাখার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সরকার সময় নষ্ট করেনি। ধন্য প্রধানমন্ত্রী! এই না হলে দায়িত্ব পালন! যে পুঁজিপতি শ্রেণির সেবা করার দাসখত লিখে তখতে বসেছেন আপনারা, তাদের প্রতি দায়িত্ব পালনে এতটুকু ফাঁক নেই!

দেশটা আসলে কার

স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশের হাত থেকে ক্ষমতা এসেছে ভারতীয় জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে। তাদের প্রতিনিধি হিসাবে তা গ্রহণ করেছিলেন কংগ্রেস নেতারা। দেশ বলতে, দেশের কল্যাণ বলতে তাঁরা যে বুর্জোয়া শ্রেণির কল্যাণই বোঝেন তা স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়েই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যে কারণে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ভগৎ সিং সহ আপসহীন ধারার বিপ্লবীরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়বার সময়ে বারবার এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন যে, ব্রিটিশের বদলে দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণির শোষণ কায়েম তাঁদের লক্ষ্য নয়। তাঁরা স্বাধীন ভারতে শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য নতুন লড়াইয়ের কথাও বলেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়েও আপসহীন বিপ্লবী ধারা এবং কংগ্রেসের আপসমুখী বুর্জোয়া নেতৃত্বের মধ্যে লড়াই হয়েছে— ভগৎ সিং, নেতাজিরা স্পষ্টভাবে বলেছেন, এর মধ্যে আছে শ্রেণিসংগ্রাম। জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্খা আর বুর্জোয়াদের ব্রিটিশের বদলে নিজেদের শাসক হওয়ার আকাঙ্খা যে এক নয়, তা স্বাধীনতার পর আরও স্পষ্ট হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে বুর্জোয়া শ্রেণির সেবাদাস হিসাবে যে দলই ক্ষমতায় বসেছে তারাই জনগণের অধিকার খর্ব করার জন্য একের পর এক পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর আমলেই পাশ হয়েছে বিনা বিচারে আটক আইন। স্বাধীনতার পরেই ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের প্রবর্তিত রাজদ্রোহ বিরোধী আইনকে আরও শক্তপোক্ত করেছে স্বাধীন ভারতের সরকার। জনগণকে ভুলিয়ে রাখতে নেহরুজি কালোবাজারিদের ল্যাম্পপোস্টে ঝোলানোর স্লোগান দিয়েছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী এসে স্লোগান দিয়েছিলেন, 'গরিবি হটাও'। বলেছিলেন, ব্যাঙ্ক-খনি জাতীয়করণ করে 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ' প্রতিষ্ঠা করবেন। সেদিন বিশ্বের একটা বড় অংশে সমাজতান্ত্রিক শিবিরভুক্ত দেশগুলির জনগণের জীবনযাত্রার উচ্চমান, নাগরিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার ভারতের জনগণকে আকর্ষণ করত। তাই বুর্জোয়া শাসকরা মানুষকে ধোঁকা দিতে সমাজতন্ত্রের নাম ব্যবহার করতে চেয়েছিল। যে কারণে এই সময় তাদেরও রাষ্ট্রের কিছুটা কল্যাণমূলক মুখ বা মুখোশ বজায় রাখতে হয়েছিল। যদিও যত দিন গেছে পুঁজিবাদের নিয়মেই সম্পদ ক্রমাগত মুষ্টিমেয় একচেটিয়া মালিকের হাতে বেশি বেশি করে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, আর অধিকাংশ জনগণ সম্পদ হারিয়ে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়েছে। পরিণামে পুঁজিবাদও পড়েছে চরম বাজার সংকটের আবর্তে। সংকট থেকে বাঁচতে তাদের বাড়াতে হয়েছে শোষণের তীব্রতা। একই সাথে রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক মুখোশটা ক্রমাগত খসে যেতে থেকেছে। নাগরিকদের ন্যূনতম বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্বও ক্রমাগত বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কর্ণধাররা ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছেন। নাগরিকদের মধ্য থেকে এর বিরুদ্ধে যাতে কোনও প্রতিবাদ উঠে আসতে না পারে তার জন্য ১৯৭০ দশক থেকেই গণতন্ত্রের মুখোশটা ঝেড়ে ফেলে ভারতের বুর্জোয়া শাসকরা ক্রমাগত দমনের নখ-দাঁতকেই নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের কর্তব্য পালনের পথ ঠাউরেছেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনিরসনীয় সংকট তখনই যে জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল, তাতে একচেটিয়া মালিকদের মুনাফার সর্বোচ্চ হার ধরে রাখতে জনগণের উপর নির্মম শোষণ চালানো ছাড়া বিকল্প ছিল না। এ ক্ষেত্রে কোনও নিয়ম-নীতির বালাই আর শাসকরা রাখতে পারেনি।

১৯৯১-এর পর সমাজতান্ত্রিক শিবিরে ভাঙন ধরলে এই মুখোশের যতটুকু টিকে ছিল, তাও খসিয়ে ফেলতে শাসকদের আর কোনও দ্বিধা হয়নি। বিশ্বায়ন-উদারিকরণের ফর্মুলায় আর্থিক সংস্কারের নামে জনগণের টাকায় গড়ে তোলা সমস্ত রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও পরিকাঠামোকে সরাসরি দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে বেচে দেওয়ার কাজ শুরু করেছিল তৎকালীন কংগ্রেস সরকার। জনগণকে শাসকরা শুনিয়েছে সমৃদ্ধির গালভরা গল্প, অন্যদিকে ক্রমাগত কেড়ে নিয়েছে অবাধে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয় জল পাওয়ার অধিকার। সড়ক থেকে বিদ্যুৎ, পরিবহণ ইত্যাদি সমস্ত কিছু চলে গেছে বৃহৎ পুঁজি পরিচালিত কর্পোরেট কোম্পানির মালিকানায়। যত উন্নয়ন আর

ছয়ের পাতায় দেখুন

কমরেড শিবদাস ঘোষ
জন্মশতবর্ষ উদযাপন

এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক, এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ছত্তিশগড়ের দুরগে ১৪ আগস্ট অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দ্বারিকা রথ। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য নেতা কমরেড আত্মারাম সাহু।

১০ আগস্ট মহারাষ্ট্রের নাগপুরের সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ সিং। সভাপতিত্ব করেন নাগপুর সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কমরেড প্রমোদ কাম্বলে

ঘাটশিলায় রাজনৈতিক ক্লাস

দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ১৯-২১ আগস্ট জেলা ও গণসংগঠনগুলির পাঁচ শতাধিক নেতা ও সংগঠককে নিয়ে এক রাজনৈতিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় ঘাটশিলার ‘মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ শিবদাস ঘোষ শিক্ষাকেন্দ্রে’। মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ‘মার্ক্সবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কয়েকটি দিক’ বইটি পড়ে কমরেডদের প্রশ্নগুলির ভিত্তিতে এই ক্লাস পরিচালনা করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু ও কমরেড রবীন সমাজপতি। উপস্থিত ছিলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেডস চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, অমিতাভ চ্যাটার্জী এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য স্বপন ঘোষাল, শংকর ঘোষ, অশোক সামন্ত, দেবাশিস রায়।

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ বিল প্রতিরোধে বিক্ষোভ

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ বিল বাতিলের দাবিতে তামিলনাড়ুর চেন্নাইতে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ। ৮ আগস্ট

সঙ্কটে চিকিৎসকরা

একের পাতার পর

আজ কে না জানে, ওই ‘অনুরোধ’ কী ভয়ঙ্কর! সরকারি কাজে নির্দেশের চেয়ে অনুরোধ আসে অনেক বেশি পরিমাণে। আর সেই অনুরোধ না মানলে একজন সাধারণ সরকারি কর্মচারীর জীবনে কি ভয়াবহ বিপদ নেমে আসে, তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন।

সবচেয়ে বড় কথা, স্বাস্থ্য বিভাগের কোনও কাজের নির্দেশ বা অনুরোধ কে করতে পারেন আর কে পারেন না, সে প্রশ্নটিই তো আজ ডাক্তারদের কাছে গোলক ধাঁধার মতো। এবেলা কোনও নির্দেশ বা অনুরোধ যদি স্বাস্থ্যভবন থেকে আসে, দুঘন্টা যেতে না যেতেই ওই অনুরোধ আসে সাধারণ প্রশাসনের কাছ থেকে। আবার বিকেল গড়াতে না গড়াতেই নির্দেশ আসে জেলা পরিষদ কিংবা স্থানীয় নেতা মন্ত্রীদের কাছ থেকে। যত না লিখিত নির্দেশ, তার বহু গুণে আসে মৌখিক নির্দেশ। লিখিত নির্দেশ চাইলে বলা হয়, আমি বলছি, এটাই কি যথেষ্ট নয়? স্বাস্থ্য দপ্তরের উপর এই রকম মৌখিক নির্দেশ যতটা না স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে আসে, তার চেয়েও বহুগুণে আসে অন্য দপ্তর, সাধারণ প্রশাসন, নেতা মন্ত্রীদের কাছ থেকে। আর এই নির্দেশ না মানলে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের নামে অভিযোগ যায় স্বাস্থ্য দপ্তরে। অমনি স্বাস্থ্যকর্তারা খড়্গ হস্তে ওই চিকিৎসকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। অন্য দপ্তরের অথবা নেতা মন্ত্রীদের দেওয়া স্বাস্থ্য দপ্তর বহির্ভূত এইসব নির্দেশ মানা যায় কি না জানতে চাইলে স্বাস্থ্য কর্তারা মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকেন, অথবা ওই চিকিৎসকের উপরে শাস্তির খাঁড়া নামিয়ে আনেন। কারণ, ওই স্বাস্থ্য প্রশাসকের টিকিটাই তো ওখানে বাঁধা রয়েছে! ফলে স্বাস্থ্য দপ্তরের এই নৈরাজ্য দীর্ঘদিন ধরে চলতে চলতে চিকিৎসকরাও আজ আর কোনও ঝুঁকি নিতে চান না। অনেকে ভুলেই গেছেন কে বা কারা তাকে নির্দেশ দিতে বা অনুরোধ করতে পারে। এই ‘বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো’র ফাঁদে পড়ে পিজি থেকে বোলপুর, বোলপুর থেকে প্রত্যন্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র— সর্বত্রই চিকিৎসকেরা আজ দিশেহারা। একটা দপ্তরের গণতন্ত্র এবং একই সাথে তার স্বাধিকার নষ্ট হলে এই পরিণতিই তো হয়! এভাবে চিকিৎসার নৈতিকতাকে বরাবরই টুঁটি টিপে ধরেছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস।

চিকিৎসা একটি মহান পেশা। বিভিন্ন সময়ে শাসক গোষ্ঠী এই পেশাকে কাজে লাগিয়ে চিকিৎসকদের দিয়ে নানা অনৈতিক কাজ করিয়ে নিচ্ছে। কখনও বদলির ভয় দেখিয়ে, কখনও প্রমোশন আটকানো থেকে শুরু করে মাইনে বন্ধ করার মতো নানা ধরনের চাপ সৃষ্টি করে এবং কর্মস্থলে সার্বিকভাবে প্রশাসনিক সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে ক্রমাগত চিকিৎসকদের দিয়ে নানা ধরনের মেডিকেল-এথিক্স বিরোধী কাজ করিয়ে নিচ্ছে শাসকরা। শুধু তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীরাই নন, মোদি থেকে যোগী— সকলেই এ কাজ করছে।

চিকিৎসা পেশার নীতি নৈতিকতার ধারণা খ্রিস্টপূর্ব চারশো বছর আগেই হিপক্রেটিসের হাত ধরে তৈরি হয়। পরবর্তী কালে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জেনেভা ডিক্লারেশনের মধ্য দিয়ে তৈরি হয় আধুনিক মেডিকেল এথিক্স এবং ওথ বা শপথ। এখনও পর্যন্ত বিশ্বের সমস্ত দেশেই চিকিৎসকরা মেডিকেল পেশায় প্রবেশের মুখে তা পাঠ করে থাকেন। বর্তমানে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার অবশ্য এই শপথের পরিবর্তে ধর্মীয় অনুশাসন যুক্ত চরক শপথ চালু করার নির্দেশ দিয়েছে, যা নিয়ে প্রবল বিতর্কের পরিবেশও তৈরি হয়েছে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেসরকারিকরণের ফলেও চিকিৎসার নৈতিকতা ব্যাহত হচ্ছে। স্বাস্থ্যকে পরিষেবা হিসেবে না দেখে যত বেশি করে পণ্য হিসেবে দেখা হচ্ছে তত নিম্নগামী হচ্ছে মেডিকেল এথিক্সের মান। সর্বোচ্চ মুনাফা লুণ্ঠনের উদগ্র বাসনা ধূলিসাৎ করছে মেডিকেল এথিক্সকে। বড় বড় নার্সিং হোম বা বেসরকারি হাসপাতালের মালিকরা চিকিৎসকদের ব্যবহার করছে মুনাফা লুঠের যন্ত্র হিসেবে। চিকিৎসকদের একাংশও তার শিকার হয়ে পড়ছেন। গোটা সমাজজীবনে ন্যায়-নীতি-মূল্যবোধের চূড়ান্ত অবক্ষয়ের সাথে সাথে, তার অঙ্গ হিসেবেই সার্বিকভাবে নিম্নগামী হচ্ছে চিকিৎসকদের নীতি নৈতিকতার মান। আর এই সুযোগটাকেই কাজে লাগাচ্ছে স্বার্থান্বেষী একদল মানুষ।

মানবসভ্যতার শত্রু ফ্যাসিস্ট হিটলার জার্মানিতে এভাবে চিকিৎসকদের ব্যবহার করেছে। হিটলারের উগ্র জাত্যভিমান ও জাতীয়তাবাদের আহ্বানে ভেসে গিয়ে চিকিৎসকরা সেখানে জীবন্ত মানুষের উপর নানা পৈশাচিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে। গ্যাস চেম্বারে ছেড়ে দিলে মানুষ কতক্ষণ বাঁচতে পারে, গর্ভবতী মহিলাকে অজ্ঞান না করে অপারেশন করলে কষ্ট সহ্য করে কতক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে, শিশুকে বরফের মধ্যে ছেড়ে দিলে কতক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে— এই সব অমানুষিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা তো সেদিন চিকিৎসকদের দিয়েই করানো হয়েছিল!

একই জিনিস দেখা গেছে পশ্চিমবঙ্গে, ঐতিহাসিক নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময়। তদানীন্তন সিপিএম পরিচালিত সরকার গুলি চালিয়ে নন্দীগ্রামের ১৪ জন আন্দোলনকারীকে হত্যা করেছিল। আন্দোলন ধ্বংস করতে মহিলাদের গণধর্ষণ করানো হয়েছিল! আর সেই ঘটনাকে চাপা দিতে সেদিন সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী-নেতারা চিকিৎসকদের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। আক্রমণের ভয়াবহতা লঘু করে দেখাতে কিছু চিকিৎসককে বাধ্য করেছিল সেই ভয়াবহ আঘাতকে ‘সিম্পল ইনজুরি’ হিসাবে লিখতে, যাতে বুলেট এবং গণধর্ষণের দগদগে দাগগুলি চাপা দেওয়া যায়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ‘বুলেট ইনজুরি’ কথাটি চাপা দিতে রাজি না হওয়ায়, একদল চিকিৎসকের ওপর নেমে এসেছিল শাস্তির খাঁড়া। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে।

আজ সময় এসেছে সমগ্র চিকিৎসক-সমাজকে একত্রিত হয়ে মেডিকেল এথিক্সের মহান পতাকাটি ঊর্ধ্বে তুলে ধরার।

বিশ্ব বিপ্লবই শোষণমুক্তির একমাত্র পথ

গুয়াহাটির সভায় কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর ৭৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো আসামেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। এই উপলক্ষে দলের আসাম রাজ্য কমিটির উদ্যোগে গুয়াহাটির রবীন্দ্রভবনে ২৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত এক সভায় দলের পলিটবুরোর প্রবীণ সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য নিচের বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতাটি তিনি অসমিয়া ভাষায় দেন। অনুবাদজনিত যে কোনও ত্রুটির দায়িত্ব আমাদের। — সম্পাদক, গণদাবী

(৪)

নির্বাচন সম্পর্কে লেনিনীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন শিবদাস ঘোষ

আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পুঁজিপতি শ্রেণির উপরে ধারাবাহিক চাপ সৃষ্টি করে যেতে হবে। ন্যায্য দাবি নিয়ে বাইরে মিটিং-মিছিল, লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলা এবং সংসদ, বিধানসভার ভিতরে যথার্থ বিরোধিতা করা— এই উভমুখী সংগ্রামী কৌশল চালিয়ে যেতে হবে। এই বৈপ্লবিক বিরোধিতার মূল কথা হচ্ছে, বিধানসভা ও সংসদের ভিতর থেকে এই পচা-গলা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আসল চরিত্র শোষিত জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা এবং এর মাধ্যমে সংসদ ও বিধানসভা সম্পর্কে শোষিত জনগণের মধ্যে যে মোহ কাজ করছে, তার থেকে তাদের মুক্ত করা। এই প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করতে চাই, সংসদের ও বিধানসভার ভিতর বর্তমানে যা চলছে, সেটা অত্যন্ত ক্ষতিকারক। বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া দলগুলি এই তথাকথিত বিরোধিতার অভিনয় করে শোষিত জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন। এই সমস্ত বুর্জোয়া দলের একমাত্র কাজ হচ্ছে শুধু ভোটের স্বার্থে বিরোধিতার ভাব দেখানো। আসলে তারা প্রকৃত বিরোধী নয়, হতেও পারে না। কারণ এই সব দলগুলো সব দিক থেকেই পুঁজিপতি শ্রেণির হাতের মুঠোয়। এদের বিরোধিতা ফাঁপা, উপর উপর। এই বিরোধিতার কোনও সারবত্তা নেই। কিন্তু গভীর ক্ষোভের কথা হচ্ছে, বামপন্থী, কমিউনিস্ট নাম নিয়ে সিপিআই(এম) এবং তাদের সহযোগী দলগুলিও একই রকম ভাবে আচরণ করছে। সরকারে থাকা দলগুলো হোক বা তথাকথিত বিরোধী পক্ষের বুর্জোয়া দলগুলিই হোক— তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল সদাসর্বদা সংসদ, বিধানসভা, নির্বাচন, সংসদীয় গণতন্ত্র— এগুলোর জয়গান গেয়ে যাওয়া। এগুলোকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় চলতে থাকা শোষণ-নির্যাতন সম্পর্কে শোষিত জনগণকে বিভ্রান্ত করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যতদিন সম্ভব অটুট রেখে বিপ্লবী আন্দোলনকে মাথা তুলতে না দেওয়া।

পুঁজিপতি শ্রেণির এই জঘন্য চক্রান্তের বিপরীতে মহান লেনিনের শিক্ষা হল, একটি দেশের প্রকৃত বিপ্লবী দলের কর্তব্য হল, যতদিন পর্যন্ত একটি পুঁজিবাদী দেশে জঙ্গি গণতান্ত্রিক আন্দোলন লাগাতার পরিচালনা করতে করতে শ্রেণিসংগ্রামের জন্ম দিয়ে তাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করার মধ্য দিয়ে বিপ্লবের আঘাতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে, রাষ্ট্রশক্তিকে উৎখাত করা না যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত পার্লামেন্টারি এবং এক্সট্রা পার্লামেন্টারি এই দুই সংগ্রামের একটাকে অপরটির পরিপূরক হিসাবে চালিয়ে যেতে হবে। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে, যে কোনও পুঁজিবাদী দেশে শোষণ, নির্যাতন চলছে, তার মূল কারণ যে সেই দেশের পুঁজিপতি শ্রেণির শাসন-শোষণ, সেখানে প্রবর্তিত নির্বাচন ব্যবস্থা, সেই নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকার, কোনও কিছুই যে শ্রমিক শ্রেণিকে, পুঁজিপতি শ্রেণির সর্বাত্মক শোষণ থেকে মুক্ত করতে পারবে না— এই সত্য সেই সব দেশের শ্রমিক শ্রেণি এবং শোষিত জনসাধারণকে গভীরে গিয়ে বোঝাতে হবে।

নিজেকে বামপন্থী কমিউনিস্ট বলে দাবি করা সিপিএম বিরোধীপক্ষে থাকা অন্যান্য বুর্জোয়া শাসক দলের মতোই আচরণ করছে। এই প্রশ্নে বিরোধী বুর্জোয়া দলগুলোর সাথে তাদের বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই। অথচ আজ দরকার মরিয়া হয়ে শাসক দলের চূড়ান্ত জনবিরোধী কাজগুলো তুলে ধরা, তাদের এক্সপোজ করা, তারা যে আসলে জনশত্রু, সেটা প্রতিপন্ন করা। কিন্তু তার কোনও চেষ্টাই এই দলগুলির তরফে নেই। তার পরিবর্তে শাসক বুর্জোয়া দলের সাথে তাদের মিত্রতার ভাবটুকুই প্রকট হয়ে উঠছে। কেবল তাই নয়, তারা যে কোনও প্রকারে জেতার জন্য নানা যুক্তি দেখিয়ে সেই সব বুর্জোয়া দলের সাথে জোট করছে।

বিপ্লবী দল সুযোগ পেলে নির্বাচনের মাধ্যমে যদি পার্লামেন্ট বা অ্যাসেম্বলিতে এক বা একাধিক প্রতিনিধি পাঠাতে পারে, তখন নির্বাচিতদের কর্তব্য হবে ছোট-বড় সমস্ত ঘটনাগুলো যতটুকু পারা যায় সেখানে উত্থাপন করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ন্যক্কারজনক শোষণমূলক চরিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরা। পুঁজিবাদী শাসক দলের নেতা-মন্ত্রী এবং আমলাতন্ত্রের অমানবিক অত্যাচারের চরিত্র তুলে ধরার মধ্য দিয়ে এই নেতা-মন্ত্রীদের সম্পর্কে এবং এই বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে যে মোহ আছে তা থেকেও তাঁদের মুক্ত করা। এখানে উল্লেখ করতে হবে যে, এই কাজগুলো সম্পূর্ণ করতে হলে সংসদে যত বেশি পারা যায় আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করা ও ঢোকার চেষ্টা করা দরকার এটা দেখাতে যে, কীভাবে বুর্জোয়া শাসকরা পুঁজিবাদের এই ক্ষয়িষ্ণু যুগে বিরোধীদের কথা বলার অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের মর্জিমাফিক স্বেচ্ছাচারী শাসন চালাতে চায়। যেসব সাধারণ মানুষ গণতন্ত্রের এই বুলিতে বিভ্রান্ত হয়, তাদেরও চোখে আঙুল দিয়ে এসব দেখিয়ে দেওয়া দরকার। যদি বিপ্লবী দলের প্রতিনিধিদের সংসদে কথা বলতে না-ও দেয়, তা সত্ত্বেও তাদের এর বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে এবং সংসদের বাইরেও এই অধিকার হরণের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই সব দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে জনগণের শোষণ-নির্যাতনের স্বরূপ, তার মূল কারণ যে পুঁজিবাদ— এগুলো জনগণের বোঝার মতো করে সংসদে, বিতর্ক সভায় বার বার তুলে ধরতে হবে। জনগণের উপর পুঁজিপতি শাসকরা যে পাশবিক অত্যাচার চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে তাদের গর্জে উঠতে হবে।

এসবের মাধ্যমেই জনসাধারণ একটা সময়ে গিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সম্পর্কে মোহমুক্ত হবে। এর বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মহান শিক্ষক লেনিনের অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার কথা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। বিপ্লবের আগে লেনিন বলেছিলেন, আমাদের আদর্শগত ভিত্তি এবং সাংগঠনিক শক্তি এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, শোষিত জনসাধারণ সব দিক থেকে জারতন্ত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন নয়, বহু জায়গায় জারতন্ত্র সম্পর্কে মোহ কাজ করছে। সে কারণে ১৯০৫-এর বিপ্লব সফল হতে পারেনি। এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সবদিক থেকে জারতন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচিত করা। সঠিকভাবে এই কাজ করার মাধ্যমে জারতন্ত্র উচ্ছেদ করার কাজ এগিয়ে যাবে। রাশিয়াতে সেই সময় সমস্ত জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত কোনও পার্লামেন্ট ছিল না। খুবই সীমিত ক্ষমতা সম্পন্ন 'ডুমা' নামে একটি ডেলিবারেটিভ বডি (যেখানে কেবল কিছু কথাবার্তা হয়, কিন্তু কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না) ছিল। তার উপর সেখানে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বও ছিল খুবই কম। ১৯০৫-এর বিপ্লবের প্রস্তুতি যখন জোর কদমে চলছিল, তখন লেনিন ডুমাতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, অর্থাৎ 'ডুমা' বয়কটের আহ্বান দেন। কিন্তু যখন ১৯০৫-এর বিপ্লব সফল হল না, লেনিন সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে জনগণকে বাইরে এক্সট্রা পার্লামেন্টারি স্ট্রাগল (পার্লামেন্টের বাইরে সংগ্রাম) তার সাথে সাথে তীব্র শ্রেণি সংগ্রাম চালিয়ে যেতে যেতে ডুমা এবং ডুমার মতো ডেলিবারেটিভ বডির ভিতর যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এর মধ্য দিয়ে জারতন্ত্র এবং তার সহযোগী রাশিয়ার বুর্জোয়া শ্রেণি এবং বুর্জোয়া দল, পেটিবুর্জোয়া, সোসাল ডেমোক্রেটিক দলগুলোর আসল স্বরূপ উন্মোচিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এর জন্য বিপ্লবী প্রতিনিধিদের ডুমা-র ভিতর তর্ক-বিতর্ক আলোচনায় অংশ নিতে হবে। জনগণের ন্যায্য দাবি নিয়ে ডুমার বাইরে যেভাবে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে, ভিতরেও যাঁরা নির্বাচিত বিপ্লবী প্রতিনিধি থাকবেন, তাঁরাও সেখানে আন্দোলনের ন্যায্যতা তুলে ধরতে তৎপর থাকবেন। পার্লামেন্ট, অ্যাসেম্বলিতে বিপ্লবীদের যাওয়ার যৌক্তিকতা এখানেই। এখানে মহান লেনিনের সেই বিখ্যাত উক্তিটি ছিল, 'আওয়ার ডিসিশন টু বয়কট ডুমা ডিউরিং দ্য গ্রোয়িং টাইড অফ রেভলিউশন অ্যান্ড এগেইন আওয়ার ডিসিশন টু এন্টার ইনটু ডুমা ডিউরিং দ্য রিসিডিং টাইড অফ রেভলিউশন, বোথ আর কারেক্ট'। সেদিন, যখন বিপ্লবের অনুকূল পরিস্থিতি ছিল না, শোষিত জনসাধারণের মধ্যে হতাশা কাজ করছিল, তখন সর্ব দিক থেকে সংগ্রাম করে পরিস্থিতি অনুকূল করার পথনির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন। বুর্জোয়া সংসদের ভিতরের অবস্থা সম্পর্কে আমি আরও উল্লেখ করতে চাই যে, শাসক বুর্জোয়া দল এবং তথাকথিত বিরোধী বুর্জোয়া দলগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক হল মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে অল্প-স্বল্প বাদানুবাদ হলেও মূলত পুঁজিপতি শ্রেণির গোলাম হওয়ার সুবাদে তারা সবাই হরিহর-আত্মা। ভোটে জেতার জন্য তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে অল্প-স্বল্প তর্কবিতর্ক হয়, এই মাত্র। তাদের মধ্যে মিত্রতার ভাবই কাজ করে।

কিন্তু নিজেকে বামপন্থী কমিউনিস্ট বলে দাবি করা সিপিএম ইত্যাদি দলগুলোর অবস্থাও আজকাল সেরকমই। তারা তো বিরোধী ভাব দেখাতে গিয়ে বিরোধীপক্ষে থাকা অন্যান্য বুর্জোয়া শাসক দলের মতোই আচরণ করছে। এই প্রশ্নে বিরোধী বুর্জোয়া দলগুলোর সাথে তাদের বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই। অথচ আজ দরকার মরিয়া হয়ে শাসক দলের চূড়ান্ত জনবিরোধী কাজগুলো তুলে ধরা, তাদের এক্সপোজ করা, তারা যে আসলে জনশত্রু, সেটা প্রতিপন্ন করা। কিন্তু তার কোনও চেষ্টাই এই দলগুলির তরফে নেই। তার পরিবর্তে শাসক বুর্জোয়া দলের সাথে তাদের মিত্রতার ভাবটুকুই প্রকট হয়ে উঠছে। কেবল তাই নয়, তারা যে কোনও প্রকারে জেতার জন্য নানা যুক্তি দেখিয়ে সেই সব বুর্জোয়া দলের সাথে জোট করছে। এই ধরনের আচরণ পরিষ্কার জনগণের প্রতি শত্রুতা করা। এখন আবার সংসদে বিরোধী পক্ষে থাকা দলগুলো আর একটা চূড়ান্ত ভণ্ডামির পথ বেছে নিয়েছে। তারা সরকারের চূড়ান্ত জনবিরোধী কাজ, আইন প্রণয়ন, এগুলোর বিরুদ্ধে জনগণের দাবি পূরণের জন্য সংসদ বা

সাতের পাতায় দেখুন

পাঠকের মতামত

শাসকরা ভোলাতে চায় ক্ষুদিরামকে

রাজ্য সরকার ১১ আগস্ট রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য ছুটি ঘোষণা করেছে রাখি পূর্ণিমা উৎসব উপলক্ষে। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন ধারার বীর শহিদ ক্ষুদিরামের আত্মোৎসর্গের দিনটির কথা তাঁদের স্মরণে এল না। ১৯০৮ সালে এই দিন ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছিল। আশার কথা, এই মহান বিপ্লবীর শহিদ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন ছাত্র-যুব সহ সমাজের সব স্তরের বিরাট সংখ্যক মানুষ।

ক্ষুদিরাম যেন না বুঝেই আবেগের তাড়নায় এতবড় কাজটি করে ফেলেছেন— এ ভাবে দেখানোর চেষ্টা করে স্বার্থান্বেষী একটা মহল। কিন্তু সেদিন কোর্টে দাঁড়িয়ে তাঁর বলিষ্ঠ স্বীকারোক্তি থেকে স্পষ্ট, তিনি এ কাজ সচেতনভাবেই করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'কিংসফোর্ডকে আমি হত্যা করতে চেয়েছিলাম। কারণ ওই ব্যক্তি ব্রিটিশ ভারতের অত্যাচারী শাসকের অন্যতম। কিংসফোর্ড গাড়িতে আছেন মনে করেই আমি বোমা ছুঁড়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কিংসফোর্ডের পরিবর্তে গাড়িতে ছিলেন দু'জন নিরপরাধ মহিলা। তাঁদের মৃত্যু ঘটেছে শুনে আমি দুঃখিত।' ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঠাট্টা করে প্রশ্ন করেছিলেন, 'ফাঁসির দড়িতে মোম লাগানো হয় কেন?' সেদিন বিপ্লবীরা চেয়েছিলেন ব্রিটিশ শাসকের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করতে এবং এই কাজে ক্ষুদিরাম সফল হয়েছিলেন। কারণ, বোমা কিংসফোর্ডের শরীরে আঘাত না করলেও তা তার মানসিক শক্তিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। তিনি মৃত্যুভয়ে কাতর হয়ে সপরিবারে মুসৌরী পালিয়ে গিয়েছিলেন। (তথ্যসূত্র ঃ ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব— ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়)

বর্তমান শাসকরাও ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগ মনে করাতে চায় না। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের শোষণের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াইয়ের প্রতীক ক্ষুদিরাম। আপামর জনসাধারণ তাঁকে স্মরণ করলে বর্তমান শাসকদের মনে ভয় জাগে— যদি তাদের অন্যায়, অত্যাচারের প্রতিবাদে ক্ষুদিরামের মতোই অকুতোভয় হয়ে ওঠে। আজকের শোষণমুক্তির পথ চিনে নেওয়ার কাজে সব দ্বিধা ঝেড়ে এগিয়ে আসে!

গৌতম দাস, মালদা

হাবড়ায় ছাত্র সম্মেলন

এআইডিএসও-র বারাসাত-বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার প্রথম ছাত্র সম্মেলন হাবড়া গার্লস হাইস্কুলে ১৪ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রত্যাহারের দাবিতে ও শিক্ষা-সংস্কৃতি-মনুষ্যত্ব রক্ষার আন্দোলনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সংগঠিত এই সম্মেলনে ১২৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশ্য অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি)-র বারাসাত-বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কমরেড তুষার ঘোষ ও এআইডিএসও-র রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অভিজিৎ মুখার্জী। প্রতিনিধি অধিবেশনে মূল বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড সামসুল আলম ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুরজিৎ সামন্ত। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অভিষেক দেবনাথ। প্রকাশ্য অধিবেশনে আমন্ত্রিত প্রাক্তন এআইডিএসও নেতা-কর্মীদের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। কমরেড সংযুক্তা দত্তকে সভাপতি ও কমরেড সুজয় ভরদ্বাজকে সম্পাদক করে ১২ জনের জেলা কমিটি এবং ১১ জনের জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়।

শিক্ষকের আত্মহত্যার জন্য দায়ী শিক্ষা দপ্তর

কলকাতা হেয়ার স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুনীল কুমার দাস অবসরের তিন বছর পরেও পেনশন না পেয়ে বর্ধমানের মেমারিতে নিজের বাড়িতে আত্মঘাতী হয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য সম্পাদক কার্তিক সাহা ১৭ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, সুনীলবাবু সাধারণ শিক্ষক ছিলেন না, তিনি রাজ্য সরকারের দ্বারা শিক্ষারত্ন সম্মানে ভূষিত। এই ঘটনা দেখিয়ে দিল পেনশন ব্যবস্থার কী করুণ হাল। রাজ্যে এ রকম বহু শিক্ষক পেনশন না পেয়ে চরম দুর্দশার শিকার হচ্ছেন। তিনি বলেন, শুধু দুঃখ প্রকাশ নয়, আশা করি শিক্ষামন্ত্রী তথা রাজ্য সরকার এই মর্মান্তিক ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে দ্রুত এবং নিয়মিত পেনশন প্রদানে সচেষ্ট হবেন।

যদি বলতেন প্রধানমন্ত্রী!

তিনের পাতার পর

বিকাশের গল্প শুনিয়েছে শাসকরা, তত দূরে চলে গেছে জনগণের অধিকার। বিজেপি তথা নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সাল থেকে জনগণের বুকের উপর দিয়ে এই সংস্কারের ইঞ্জিন আরও বেশি জোরে চালিয়েছেন। অন্যদিকে জনগণকে শুনিয়ে চলেছেন, 'বিকাশ', উন্নয়নের কথা। কবে তা ধরা দেবে হতভাগ্য সাধারণ মানুষের কাছে? এ কথা তুললেই মোদিজি তাঁর গোল-পোস্টটাই ক্রমাগত সরিয়ে নিয়ে চলেন। প্রথমে শোনা গিয়েছিল তিনি সব কালো টাকা উদ্ধার করে ১৫ লক্ষ করে টাকা সব ভারতবাসীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢেলে দেবেন। তারপর বলে চলেছেন, আসবে 'আচ্ছে দিন', হবে 'স্বচ্ছ ভারত', তারপর এল 'সব কা সাথ সব কা বিকাশ', এখন শোনা যাচ্ছে 'আত্মনির্ভর ভারত', 'ডিজিটাল ভারত', 'ভোকাল ফর লোকাল'। অবশেষে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের বাজেটে নরেন্দ্র মোদিজির সরকার নাগরিকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে 'অমৃতকাল' অর্থাৎ স্বাধীনতার ৭৫ বছর থেকে শুরু করে তার শতবর্ষ— চাকরি না পেয়ে, একবেলা আধপেটা খেয়ে কিংবা মাঝে মাঝে না খেয়ে, এই ২৫টা বছর বাঁচতে পারলে জনগণ দেখবে সমৃদ্ধির জোয়ার! মুষ্টিমেয় পুঁজিমালিকের সমৃদ্ধির জোয়ারের জন্য কিন্তু অপেক্ষা করতে হয়নি! এ দেশের গণতান্ত্রিক সংসদীয় ব্যবস্থা তবে কার স্বার্থে রচিত? বুঝে নিতে অসুবিধা হয় কি?

নাগরিক অধিকার ছাড়াই গণতন্ত্র!

গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে বুর্জোয়ারাই নাগরিক অধিকার, রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির আপাত স্বাধীনতা, স্বাধীন বিচারবিভাগের কথা তুলেছিল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চরম সংকটের যুগে একচেটিয়া সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি নিয়ন্ত্রিত বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার কর্ণধাররা বিচারবিভাগ সহ সমস্ত ক্ষেত্রকেই সরাসরি বুর্জোয়াদের আজ্ঞাবহ আমলাতন্ত্রের দাস করে তুলতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে। এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, আজকের যুগে সমস্ত বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মধ্যেই ফ্যাসিবাদী ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। তিনি ফ্যাসিবাদের মূল তিনটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে এ যুগের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে চিহ্নিত করেছিলেন— ১) বেশিরভাগ প্রতিযোগীকে প্রতিযোগিতার বাইরে ঠেলে দিয়ে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির হাতে অধিকাংশ সম্পদ জমা হওয়া। ২) একচেটিয়া মালিকগোষ্ঠীর সেবাদাস মুষ্টিমেয় রাজনীতিকের হাতে অধিকাংশ ক্ষমতা কুক্ষিগত হওয়া। সংসদীয় ব্যবস্থা, প্রশাসন, বিচারবিভাগকে একচেটিয়া পুঁজির আজ্ঞাবহে পরিণত করা। ৩) চিন্তায় আধ্যাত্মিকতা, অন্ধবিশ্বাস, কূপমণ্ডুকতার সাথে বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত জ্ঞানের মিশেল দেওয়ার মধ্য দিয়ে ছাঁচেঢালা সংস্কৃতির জন্ম দেওয়া।

ভারতের দিকে তাকালে দেখা যাবে ফ্যাসিবাদের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যই এ দেশের গায়ে প্রকট। কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী যেমন জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন, 'কমিটেড জুডিশিয়ারি' (সরকারের আজ্ঞাবহ বিচারবিভাগ) চেয়ে সরাসরি সওয়াল করেছিলেন। কংগ্রেসের আমলেই গায়ের জোরে ভোট লুঠ, আমলাতন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে ভোটের ফলে নিখুঁত কারচুপি ইত্যাদি অধিকার হরণের প্রক্রিয়া শুরুই হয়েছিল। নরেন্দ্র মোদির আমলকে এর সাথে তুলনায় বলা যেতে পারে অঘোষিত জরুরি অবস্থার কাল। ২০১৪ থেকেই বিজেপি লোকসভায় একচ্ছত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভোগ করে আসছে। এমনিতেই সংসদে উভয় কক্ষেই সরকারি কিংবা বিরোধী আসন আলো করে যাঁরা ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধি সেজে বসে আছেন, তাঁদের অধিকাংশই বহু-কোটিপতি। জনগণের দুঃখ দুর্দশার সাথে তাঁদের যোগ অতি ক্ষীণ। এর মধ্যেও যতটুকু হতে পারত, দেখা যায় জনজীবনের কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সংসদে আলোচনা হওয়াটাই এখন ব্যতিক্রমী ঘটনায় দাঁড়িয়েছে। সরকারের বিরুদ্ধে রায় দিলে তৎক্ষণাৎ বিচারপতিকে বদলি অথবা নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে, আর সরকারের মর্জি অনুযায়ী চললে অবসর নিয়েই উচ্চপদ এমনকি মনোনীত সাংসদ পর্যন্ত হওয়া যাবে। এটাই আজ বিচারবিভাগের 'স্বাভাবিক' ঘটনা। বিশেষ কিছু শিল্পপতি গোষ্ঠীর সুবিধার্থে কাজ করার জন্য বিচারবিভাগকে চাপ দিয়েছে সরকার এ অভিযোগ খোদ সুপ্রিম কোর্টেই শোনা গেছে। এমনকি গুজরাট গণহত্যার জন্য বিজেপির শীর্ষ নেতাদের আদালতে অভিযুক্ত করেছিলেন যে বিচারক, তাঁর রহস্য মৃত্যু ঘটলেও কোনও তদন্ত হয়নি। উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকার আন্দোলনকারীদের উপর কোটি কোটি টাকা জরিমানা চাপিয়েছে, সম্পত্তি বজয়াপ্ত করেছে। দিল্লি দাঙ্গায় যারা উস্কানি দিয়েছে, জেএনইউ কিংবা জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা করেছে তাদের একজনকেও শাস্তি না দিয়ে সরকার মিথ্যা মামলা দিয়েছে প্রতিবাদী ছাত্রদের উপর। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, দলিত কিংবা জনজাতিভুক্ত মানুষের উপর হিন্দুত্ববাদের চ্যাম্পিয়ান সংঘপরিবার নানা আক্রমণ চালিয়েছে। বিজেপির শীর্ষ নেতারা উত্তরপ্রদেশের ভোটে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নানা বিষোদগার করছেন। সংঘ পরিবারের ঘনিষ্ঠ তথাকথিত ধর্মগুরুরা উত্তরাখণ্ডে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে সংখ্যালঘুদের উপর হামলা করে গণহত্যার ডাক দিল, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে আসা ছাত্রীদের হিজাবের অজুহাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঢোকায় বাধা দেওয়া হচ্ছে— সরকারের মদতেই তো! কোন অধিকার জনগণকে দেওয়ার কথা বলছেন আপনি প্রধানমন্ত্রী?

কৃষি ব্যবস্থাকে একচেটিয়া মালিকদের হাতে পুরোপুরি তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে দেশের হাজার হাজার কৃষক একবছরের বেশি সময় ধরে ধর্না দিলেন দিল্লির উপকণ্ঠে। ৭০০ জনের বেশি কৃষক এই আন্দোলনে প্রাণ হারালেন, প্রধানমন্ত্রী এক বছরে একবার তাঁদের দাবি শোনার সময় করতে পারেন নি? বাঁচার দাবি তুলে খুব বেশি অধিকার চেয়েছিলেন কৃষকরা? কেন্দ্রীয় সরকার শ্রম আইন সংশোধন করে যে শ্রম কোড এনেছে তাতে শ্রমিকের চাকরির স্থায়ীত্বের অধিকার, ন্যায্য মজুরির অধিকার, কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষার অধিকার, সামাজিক সুরক্ষার অধিকার সব কিছু কেড়ে নেওয়া হল। শ্রমিকরা এর প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন, ধর্মঘটও করেছেন। প্রধানমন্ত্রী— আপনি দেশকে বলুন, কোন বাড়তি অধিকার শ্রমিকরা চাইছেন?

প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব পালনের উপদেশ দিচ্ছেন! তিনি এবং তাঁর সরকার সহ স্বাধীনতার পর থেকে এদেশের রাষ্ট্রের সব কর্ণধাররাই জনগণের জন্য দায়িত্বপালনের যে বহর দেখিয়েছেন, তাতে জনগণের সামনে একটি কর্তব্যই বাকি থাকে। তা হল, সংঘবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অধিকার আদায় করা। আর সবচেয়ে বড় যে কর্তব্যটি খেটে খাওয়া জনগণের সামনে আজ উপস্থিত— এই শোষণযন্ত্র-স্বরূপ বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থাটিকেই ভেঙে ফেলে নতুন শোষণহীন সমাজের পথে এগিয়ে যাওয়া।

কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের ভাষণ

পাঁচের পাতার পর

বিধানসভার বাইরে কোনও আন্দোলন করে না। কিন্তু বিধানসভা, সংসদে মাঝে-মধ্যে জনগণের কিছু কিছু জরুরি দাবি তুলে, স্লোগান দিয়ে সংসদ, বিধানসভাকে কাজ করতে দেয় না। কখনও কখনও দিনের পর দিন ওয়াক আউট করে। স্লোগান তুলে বেরিয়ে যায় আর তার মাধ্যমে তারা পুঁজিবাদী শাসক দলের সুবিধাই করে দেয়। কোনও বাধা না পেয়ে শাসক দল জনবিরোধী প্রস্তাব, বিল ইত্যাদি নিয়ে প্রথমে অধ্যাদেশ জারি করে এবং পরে বিরোধীশূন্য সংসদে নিমেষের মধ্যে পাশ করিয়ে নেয়। শুধু ভোটের জন্য এবং পুঁজিপতি শ্রেণিকে সাহায্য করার জন্যই তারা এই আত্মঘাতী পথ অনুসরণ করছে। এর মাধ্যমে পুঁজিপতি শ্রেণির শাসন-শোষণের চরিত্র, তাদের চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপ— এগুলো শোষিত জনগণের সামনে কীভাবে তুলে ধরা হবে? একদিন বা দু'দিনের জন্য এই ধরনের প্রতিবাদের পথ বেছে নেওয়া যায়। কিন্তু দিনের পর দিন পার্লামেন্ট অচল করে রাখলে শাসক দলের মুখোশ খুলে দেওয়ার বিপ্লবী কর্তব্য কীভাবে পালন করা হবে? অন্য দিক থেকে এটা নিঃসন্দেহে শাসক পুঁজিবাদী দলের পক্ষে বিরোধী পক্ষের বদনাম করতে সাহায্য করবে। তারা জনগণকে বলবে, জনগণের ভোটে জিতে বিরোধীপক্ষ দিনের পর দিন পার্লামেন্ট অচল করছে কার জন্য? সর্বোপরি শোষিত জনগণের কাছে বুর্জোয়া ভোট রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিপন্ন হবে কেমন করে?

আসলে পক্ষ মাত্র দুটো

এই প্রেক্ষাপটে আমি মহান শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ স্মরণ করাতে চাই। বুর্জোয়া সংসদের এই সর্বশেষ সুবিধাবাদী আচরণ তিনি দেখেননি, কিন্তু তখনই সুবিধাবাদী রাজনীতির আভাস তিনি পেয়েছিলেন। এসব দেখে তিনি বলেছিলেন, এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় দেখতে বহু দল থাকলেও আসলে পক্ষ মাত্র দুটো। একটা হচ্ছে সমস্ত পুঁজিবাদী দল মিলে একটা পুঁজিবাদী পক্ষ, আর তার বিপরীতে প্রকৃত বিরুদ্ধ শক্তি, প্রকৃত বিপ্লবী শক্তি, বিপ্লবী পক্ষ।

আপনারা লক্ষ করবেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের এই অভ্রান্ত বিশ্লেষণ কেমন করে প্রতিদিন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। কংগ্রেস থেকে বিজেপি, বিজেপি থেকে কংগ্রেস, তৃণমূল থেকে বিজেপি, বিজেপি থেকে তৃণমূল— ঢেউয়ের মতো দলবদলের কথা আজ আর বিস্তারিত বলার দরকার নেই। ভারতবর্ষে বুর্জোয়া দলগুলোর নেতামন্ত্রীদের এই যে দলবদল প্রতি দিন ঘটছে, এগুলোর মাধ্যমে কেন্দ্র এবং বেশিরভাগ রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার ফলে বিজেপিই বেশি লাভবান হচ্ছে। পুঁজিপতি শ্রেণির সম্পূর্ণ সহযোগিতা পেয়ে যতই আরএসএস, বিজেপির রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততই পুঁজিপতি শ্রেণির শোষণের তীব্রতা মারাত্মকভাবে বাড়ছে।

জাতি ধর্ম ভাষা বর্ণ নির্বিশেষে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব অংশের জনসাধারণের উপরেই এই বুর্জোয়া চিন্তার কোপ পড়ছে। এই চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে যাতে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে না ওঠে সেটা সুনিশ্চিত করার জন্য সরকারি ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তারা দেশের ভিতরে অতি নিপুণভাবে তীব্র মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। নিরাপত্তার অভাবে মুসলিম জনসাধারণ নিদ্রাহীন জীবনযাপন করছেন। এর ফলে কোনও হিন্দুর কি উপকার হচ্ছে? হিন্দু ধর্মের কোনও মহান উদগাতা কি মানুষের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ, হিংসা, হত্যার পথনির্দেশ দিয়েছেন? ভারতের কোনও মনীষী, কোনও মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতা হিন্দু-মুসলমান জনগণের মধ্যে হত্যাযজ্ঞ লাগিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন? একজনও মহান ব্যক্তি, একজনও সৎ মানুষ কি এই জঘন্য কাজে উৎসাহ দিয়েছেন বলে দেখা যাবে? পুঁজিপতি শ্রেণি আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই অবিভক্ত ভারতে এই জঘন্য সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দিয়েছে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যর্থ করার জন্য জনগণকে তাদের শোষণের বলি করার জন্য, তারা এ সব মারাত্মক সাম্প্রদায়িক শক্তির জন্ম দিয়েছে এবং অখণ্ড ভারতবর্ষকে খণ্ড খণ্ড করেছে, শ্রমিক শ্রেণির, সাধারণ মানুষের সর্বনাশ করছে।

শুধু ভোটে হারালেই বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে পরাস্ত করা যাবে না

আজ পুঁজিপতি শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শোষিত, নিপীড়িত গরিব হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের ক্ষোভ ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছে, আর সেটা বানচাল করার জন্য পুঁজিপতি শ্রেণিরই অতি বিশ্বস্ত দল আরএসএস-বিজেপি নিকৃষ্ট মুসলিম বিদ্বেষের জন্ম দিচ্ছে। নিশ্চিতভাবে এর ফলে তারা হিন্দু মুসলমানের শোষিত জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকেই ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। যে কোনও মূল্যেই এই সর্বনাশা সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পরাস্ত করতে হবে। শক্তিশালী আদর্শগত, ভাবগত আন্দোলন চালিয়ে জনগণের মন থেকে আরএসএস, বিজেপির চূড়ান্ত ক্ষতিকারক প্রভাব নির্মূল করতে হবে। শুধু ভোটে হারালেই আরএসএস, বিজেপি নির্মূল হয়ে যাবে না। এটা ভুললে চলবে না, এই উপমহাদেশে মুসলিম মৌলবাদী শক্তিগুলোর যে চূড়ান্ত ক্ষতিকারক কার্যকলাপ চলছে, তার বিরুদ্ধে হিন্দু জনসাধারণের মনে ন্যায্য ক্ষোভ আছে। অসৎ উদ্দেশ্য থেকে এই ক্ষোভকে ব্যবহার করেই মারাত্মক ধরনের প্রচার চালিয়ে ভারতের মাটিতে নিরীহ খেটে-খাওয়া নির্যাতিত-শোষিত মুসলিম জনসাধারণের বিরুদ্ধে বিজেপি-আরএসএস তীব্র ঘৃণার জন্ম দিয়েছে। একে যদি নির্মূল করতে হয়, তা হলে সুবিধাবাদী, বুর্জোয়া ভোটের রাজনীতি চর্চা করে কোনওপ্রকারে একবার বিজেপিকে হারাতে পারলেই হবে না। অবশ্যকর্তব্য হবে হিন্দু-মুসলমান, জাতি-ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে সমস্ত শোষিত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে পুঁজিবাদী শোষণ থেকে জন্ম নেওয়া যে জ্বলন্ত সমস্যাগুলো তাদের টুঁটি টিপে মারছে, তার বিরুদ্ধে লাগাতার শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলা এবং আপসহীন মানসিকতা নিয়ে ন্যায্য দাবিগুলি আদায় করার জন্য নির্ভীক মানসিকতায় এগিয়ে যাওয়া, উন্নত নীতি-নৈতিকতা এবং উচ্চ মূল্যবোধের আধারে এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালিত করা। এই আন্দোলন যে উন্নত সংস্কৃতির জন্ম দেবে, সেটাই হবে আরএসএস-বিজেপির নরঘাতী সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিহত করার একমাত্র সঠিক আদর্শ, অতি শক্তিশালী হাতিয়ার।

এই চরিত্রসম্পন্ন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনা করার মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণ অতি সহজেই সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক চিন্তার ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হবেন। শুধু তাই নয়, বাইরে এই শক্তিশালী গণআন্দোলন চালিয়ে যেতে যেতে যখনই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, তখনও এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা সমস্ত দল এবং শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনেও লড়বে এবং এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের শক্তিই নির্বাচনে বিজেপির পরাজয় সুনিশ্চিত করবে।

এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই, তীব্র সাম্প্রদায়িক আরএসএস-বিজেপিকে শক্তিহীন করার এই পথ আমাদের হাতে থাকলেও এটাকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে মারাত্মক ধরনের প্রতিবন্ধকতাও কাজ করছে। বিজেপিবিরোধী নানা নামের যে বুর্জোয়া দলগুলো রয়েছে, তাদের ভোট রাজনীতির বাইরে কোনও ভাবেই আনা যায় না। অন্য দিকে নিজেদের বামপন্থী বলে পরিচয় দেওয়া সিপিআই, সিপিএম ইত্যাদি দলের অবস্থা একই। তারা ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তুলতে মোটেই আগ্রহী নয়। দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণ, যারা বিজেপির সাম্প্রদায়িকতার তীব্র বিরোধী, তাদের সেই বিরোধিতাকে ভোটে কাজে লাগাতে বিজেপিকে পরাস্ত করার স্লোগান তুলে কংগ্রেস ইত্যাদি বুর্জোয়া দলের সাথে মিত্রতা গড়ে তোলার জন্য তারা খুবই ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে কোনও বাধা না পেয়ে বিজেপি তীব্র মুসলিম বিদ্বেষ সৃষ্টি করছে।

কংগ্রেস প্রভৃতি তথাকথিত বিরোধী বুর্জোয়া দলগুলো সংখ্যালঘু জনগণের জীবন-জীবিকা এবং তাদের ধর্ম বিশ্বাসের উপরে এই ফ্যাসিবাদী আক্রমণ চুপচাপ দেখে চলেছে, প্রতিরোধ করার কোনও নামই নেই। তাদের তথাকথিত নরম হিন্দুত্ব বিজেপিরই সুবিধা করে দিচ্ছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আরএসএস-বিজেপি এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে বিজেপি বিরোধী দলগুলোকে আরও বিভক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তায় বলীয়ান একটি প্রকৃত মার্ক্সবাদী দল। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার বাইরে জনগণের হাতে শোষণ মুক্তির লড়াইয়ে অন্য কোনও হাতিয়ার নেই, অন্য কোনও আদর্শ নেই। কংগ্রেস, বিজেপি ইত্যাদি বুর্জোয়া দলগুলো শোষিত জনগণের শত্রু। আবার এ কথাও সত্য যে, সিপিএমের মতো তথাকথিত বামপন্থী দলগুলোও আজ গণআন্দোলনের ঝান্ডা পরিত্যাগ করে দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকেই সাহায্য করছে। আর এটাও দেখা যাচ্ছে যে, শাসক-বুর্জোয়া শ্রেণিও তাদের এই 'বামপন্থা'-কে ক্রমাগত উৎসাহ দিচ্ছে। বামপন্থার নামে শাসন চালিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছর তারা পুঁজিবাদের সেবা করেছে। এটা জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কিছু নয়। দ্বিতীয়ত, মনে রাখতে হবে, হিন্দু উগ্রতার বিরুদ্ধে মুসলিম উগ্রতা দিয়ে কোনও লাভ হবে না বরং ক্ষতি করবে। সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃত প্রতিষেধক হচ্ছে কমিউনিজমের ভাবধারা। সুতরাং হিন্দু-মুসলমান, জাতি ধর্ম-ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষকে কমিউনিজমের পতাকা তলে একত্রিত হতে হবে। বিপ্লবের পতাকার নিচে সকল মেহনতি জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করে সাম্প্রদায়িকতাকে, সকল সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করতে হবে।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে সংগ্রাম, আর পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম— এই দুটি মিলিয়ে এলাকায় এলাকায় সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিহত করতে হবে। এই উদ্যোগ আপনারা গ্রহণ করুন। আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই, ভারতবর্ষে জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ গরিব মানুষ, খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষ। তারা শ্রমজীবী। তারা ঐক্যবদ্ধ হলে বিজেপি, আরএসএস-কে হটে যেতেই হবে। আমি বিভিন্ন সভায় কথাটা বলেছি যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বাংলায় মুখ্যত বামপন্থী ভাবধারায় যখন স্বাধীনতা আন্দোলন চলেছিল নেতাজির নেতৃত্বে, তখন হিন্দু মহাসভার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে জায়গা দেয়নি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারার ভিত্তিতে এই ধরনের বলিষ্ঠ বামপন্থী আন্দোলনের প্রবাহ তৈরি করতে হবে।

পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের লক্ষ্য সামনে রেখে অবিরাম কাজ করে যেতে হবে। মিলিট্যান্ট (জঙ্গি) গণআন্দোলন, শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। এই কাজ করতে গিয়ে আমরা প্রতিদিন কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে বিপ্লবী শিক্ষায় শিক্ষিত হব। মনে রাখতে হবে, অন্যায় ব্যবস্থা চিরদিন থাকে না। দেখুন, পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছর সিপিএমের শাসন মানুষ উচ্ছেদ করেছে। ভারতবর্ষে কংগ্রেসের ৫১ বছর ধরে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনেরও পতন ঘটিয়েছে মানুষ। এভাবে বিজেপিকেও যেতে হবে। অন্যায়ের উপর কেউই বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। সংখ্যালঘু মানুষের উপর বিজেপির এই আক্রমণ, মুসলিম বিদ্বেষ— এসবের অবসান ঘটাবে বাম ভাবধারায় সংগ্রামী জনগণই।

এ সংগ্রামে পথপ্রদর্শক আদর্শ হবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। তার ভিত্তিতেই গড়ে উঠবে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। উগ্র সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষেধক পাল্টা উগ্র সাম্প্রদায়িকতা নয়। সাম্প্রদায়িকতাকে নির্মূল করার একটাই উপায়— বামপন্থী ভাবধারার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুনরুজ্জীবন ঘটানো। সমস্ত গোষ্ঠীর মানুষকে নিয়ে গণতান্ত্রিক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা ও সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়েই মারাত্মকভাবে মাথাচাড়া দেওয়া সাম্প্রদায়িকতার বিপদ মোকাবিলা করা সম্ভব। (শেষ)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

নয়া জাতীয় শিক্ষানীতিতে বাধাপ্রাপ্ত হবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বললেন অধ্যাপকরা

অধ্যাপক সংহতি মঞ্চের পক্ষ থেকে খড়্গপুর কলেজে ২৪ জুলাই অনুষ্ঠিত হল ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম বিষয়ক ওয়ার্কশপ। উদ্বোধনী ভাষণ দেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দেবব্রত বেরা ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দুর্গাশঙ্কর রথ। যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকার সংসদীয় বিতর্ক ছাড়াই এবং জনমতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে বক্তারা তার তীব্র বিরোধিতা করেন।

'ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম' সম্পর্কে বক্তারা বলেন, এর মাধ্যমে বেদ, পুরাণ, মনুস্মৃতি ইত্যাদি সংস্কৃত শাস্ত্র, বাণভট্টের কাদম্বরী নাটকে বর্ণিত চৌষট্টি কলা, সপ্তঋষির ধারণা, যোগ, লিখিত মাধ্যম ছাড়াই বেদ শিক্ষার শ্রুতিনির্ভর ব্যবস্থা ইত্যাদি ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। অথচ এ থেকে তাঁরা বাদ দিয়েছেন এ দেশের মাটিতে গড়ে ওঠা প্রাচীনকাল এবং মধ্যযুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় অবদানগুলিকে। সেখানে স্থান পায়নি লোকায়ত দর্শনের বস্তুবাদী ধারণা। আর্যভট্ট, ভাস্কর, কণাদ, শ্রীধরাচার্য, চরক, সুশ্রুত, জীবক প্রমুখ ব্যক্তিদের হাত ধরে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা কিংবা প্রাচীন রসায়নবিদ্যা, ধাতুবিদ্যার অগ্রগতি ও চর্চা কখন, কেন বন্ধ হয়ে গেল তার ইতিহাসও এর মধ্যে নেই। এমনকী ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নবজাগরণকে ভিত্তি করে যে উন্নত চিন্তা ও মূল্যবোধ এসেছিল এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অভুতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছিল তাও এর মধ্যে স্থান পায়নি। বক্তারা বলেন, এর মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গড়ে উঠবে অন্ধবিশ্বাস এবং উগ্র ধর্মভিত্তিক জাত্যাভিমান। মারাত্মকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া। ২০ জন অধ্যাপক বক্তব্য রাখেন। সঞ্চালনা করেন অধ্যাপক সোমনাথ দে ও অধ্যাপক মঙ্গল নায়ক।

মেডিকেল ছাত্রদের রাজনৈতিক ক্লাস

এআইডিএসও পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল ইউনিটের উদ্যোগে এ যুগের অন্যতম মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষের 'মার্ক্সবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কয়েকটি দিক' বইটি নিয়ে ১৩-১৪ আগস্ট কলকাতায় একটি রাজনৈতিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ থেকে আসা মেডিকেল, ডেন্টাল, নার্সিং, প্যারা মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের নানা প্রশ্নের ভিত্তিতে আলোচনা করেন এসইউসিআই(সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ডাঃ সুভাষ দাশগুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় কমিটির সহসভাপতি ডাঃ মৃদুল সরকার, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ডাঃ শুভঙ্কর চ্যাটার্জী, ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক মণিশংকর পট্টনায়ক প্রমুখ।

প্রধানমন্ত্রীর কলসির অমৃত জনগণের জন্য নয়

দেশের স্বাধীনতার ৭৫তম পূর্তিতে প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। গত আট বছর ধরে দিচ্ছেন, এবারও দিলেন। 'হর ঘর তিরঙ্গা', 'স্বাধীনতার অমৃতকাল'-এর নামে প্রচারের তুফান তোলার চেষ্টা হল শাসক দলের তরফ থেকে। আড়াল করার চেষ্টা হল দেশের হতদরিদ্র মানুষের ঘর না থাকা, পেটভরা খাবার না পাওয়া, বেঁচে থাকার অধিকার না পাওয়ার মতো জরুরি বিষয়গুলি। সোসাল মিডিয়ায় তেরঙা পতাকার ভিড়ে হারিয়ে গেল দেশের অগণিত চাষি-শ্রমিক-সাধারণ মানুষের দুঃসহ জীবনযন্ত্রণা।

স্বাধীনতা দিবসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী দারিদ্রের অতলে তলিয়ে যাওয়া জনগণের জন্য মূল্যবৃদ্ধির মোকাবিলা করা, বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার কথা ভুলেও উচ্চারণ করলেন না। মঞ্চে যখন তিনি বলছেন মহিলাদের যেন অসম্মান করা না হয়, ঠিক তার পরই বিজেপির নেতারা গুজরাট গণহত্যার সময় বিলকিস বানোর ধর্ষণকারী এবং তাঁর পরিবারের ১৪ সদস্যের নৃশংস হত্যাকারীদের জেল থেকে ছেড়ে দিয়ে সংবর্ধনা দিয়েছে, মিষ্টি বিতরণ করেছে। এই সম্মানই কি মহিলাদের দিলেন প্রধানমন্ত্রী?

প্রধানমন্ত্রী বললেন, শততম স্বাধীনতা দিবসে ভারতকে উন্নত দেশে পরিণত করবেন তিনি। করবেন কীভাবে? কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ না করে দেশকে উন্নত করা সম্ভব কি?

দুর্নীতির বিরুদ্ধে, জাতপাত-সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল প্রধানমন্ত্রীর মুখে। আর ওদিকে উচ্চবর্ণের জন্য রাখা কলসী থেকে জল খাওয়ার অপরাধে রাজস্থানে উচ্চবর্ণের শিক্ষকের হাতে ৯ বছরের দলিত শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটল ঠিক দু'দিন আগে। রাজস্থানে তাঁর দলের এক নেতা সংখ্যালঘুদের পিটিয়ে মারার ডাক দিয়েছেন 'গোরক্ষার' অজুহাতে জাতপাতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা তাঁর মুখে সাজে কি? আর দুর্নীতি বিরোধী তাঁর লড়াই কি কেবল বিরোধী দলগুলির নেতা-মন্ত্রীদের দুয়ারে সিবিআই-ইডি পাঠানোতেই সীমাবদ্ধ? তাঁর দলের নেতারা তো খনি-রাফাল-কফিন-ব্যাপম সহ অসংখ্য দুর্নীতিতে অভিযুক্ত, রাম-নাম করতে করতে অযোধ্যায় রামমন্দিরের জমি নিয়েও তারা কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করছে। আর পি এম কেয়ার ফান্ড! সেটা তো বর্তমান কালে সবচেয়ে বড় দুর্নীতি।

আর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই! সাম্প্রদায়িকতাই বিজেপির প্রধান পুঁজি। ভোটে জেতার জন্য ধর্মকে পুঁজি করে বারবার তারা হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে হানাহানি লাগিয়েছে। বিজেপি নেতাদের 'অমৃত'বচনে সাম্প্রদায়িকতার আগুন ইন্ধন পেয়েছে। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, গুজরাট সহ সারা দেশে একের পর এক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। কর্ণাটকে বিজেপি সরকার এমন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি করে রেখেছে যে, স্বাধীনতা দিবসের দিন পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়েছে।

এবারের স্বাধীনতা দিবসের সময় আগের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি প্রধানমন্ত্রী হয়ত ভুলে গিয়েছিলেন কিংবা ভুলতে চেয়েছিলেন! তিনি ঘোষণা করেছিলেন, ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ হবে, সবার জন্য বাড়ির ব্যবস্থা হবে ইত্যাদি। ২০২২-এর প্রায় শেষে এসে কৃষকরা দেখছেন, সেচ-সার-কীটনাশকের বিপুল খরচে চাষের খরচ বহুগুণ বেড়ে গেছে। আজও চাষের জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করে বসে থাকতে হয়, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি সত্ত্বেও অনেক চাষির খেতে জল পৌঁছয় না, উন্নত প্রথায় চাষ তো দূরের কথা। এর প্রভাব পড়ছে কৃষিজীবী মানুষ সহ জনসাধারণের উপর। চাল, গমের দাম বেড়েছে কয়েক গুণ। শুধু নুন ভাত খাওয়া মানুষের চালটুকু জোগাড় করতে নাভিশ্বাস উঠছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বিজ্ঞাপন ছেয়ে রয়েছে সর্বত্র, অথচ প্রকল্পের ৭০ শতাংশ কাজই হয়নি। বহু জায়গায় প্রকৃত প্রাপক ঘর পাচ্ছেন না, চলছে দলবাজি-স্বজনপোষণ-দুর্নীতি।

স্বাধীনতা দিবসের সময় আগের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি প্রধানমন্ত্রী হয়ত ভুলে গিয়েছিলেন কিংবা ভুলতে চেয়েছিলেন! তিনি ঘোষণা করেছিলেন, ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ হবে, সবার জন্য বাড়ির ব্যবস্থা হবে। ২০২২-এর প্রায় শেষে এসে কৃষকরা দেখছেন, সেচ-সার-কীটনাশকের বিপুল খরচে চাষের খরচ বহুগুণ বেড়ে গেছে। আজও চাষের জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করে বসে থাকতে হয়। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বিজ্ঞাপন ছেয়ে রয়েছে সর্বত্র, অথচ প্রকল্পের ৭০ শতাংশ কাজই হয়নি।

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী হলে কালো টাকা উদ্ধার করবেন। প্রত্যেক দেশবাসীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা করে পৌঁছেও দেবেন। বহু সাধারণ মানুষ কালো টাকা উদ্ধারের কথাটা বিশ্বাস করেছিল, ভেবেছিল দেশের প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই মিথ্যা বলবেন না। অথচ তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই বলেছেন, এটা আসলে 'জুমলা'। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, বছরে দু'কোটি বেকারের চাকরি দেবেন। চাকরি দেওয়া দূরের কথা, বছরে লক্ষ লক্ষ বেকার নতুন করে তৈরি হচ্ছে। তবে কোনও প্রতিশ্রুতিই রক্ষা করেননি প্রধানমন্ত্রী, এ কথা বলা যাবে না।

শিল্পপতিদের অবাধ ছাড়ের, তাদের লক্ষ কোটি টাকা ঋণ মকুবের, তাদের প্রায় বিনা পয়সায় জমি, বিদ্যুৎ, খনি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করে চলেছেন। তার দাক্ষিণ্যেই তো আদানি-আম্বানি বিলিওনিয়ারের জগতে বিশ্বের এক-দু নম্বর হওয়ার দৌড়ে টেসলার এলন মাস্ক, লুইস ভুইটোর বার্নার্ড আরনল্ট এবং আমাজনের জেফ বেজোসের কাঁধে কাঁধ রেখে লড়াই করছে! বিজেপির 'দানেই' তো লজ্জাজনকভাবে করোনা অতিমারির সময় আদানি-আম্বানিদের সম্পদ বেড়েছে বহুগুণ। ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটির রিপোর্ট ২০২২ অনুযায়ী, দেশের ১ শতাংশ ধনীর হাতে ২২ শতাংশ সম্পদ এবং ১০ শতাংশ ধনীর হাতে দেশের ৫৭ শতাংশ সম্পদ রয়েছে। অথচ ৫০ শতাংশ মানুষের মিলিত সম্পদের পরিমাণ মাত্র ১৩ শতাংশ। ধনীদের হাতে গচ্ছিত সম্পদের রমরমাও বিজেপি সরকারের দৌলতে। ফলে প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন ধনকুবেরদের ক্ষেত্রে।

এর থেকে একটা জিনিস পরিস্কার, প্রধানমন্ত্রী জনসাধারণকে যত প্রতিশ্রুতিই দিন না কেন, তাঁর কলসির অমৃত শুধু ধনকুবেরদের জন্য। সাধারণ মানুষ পেয়েছে শুধুই গরল।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com